

E-BOOK

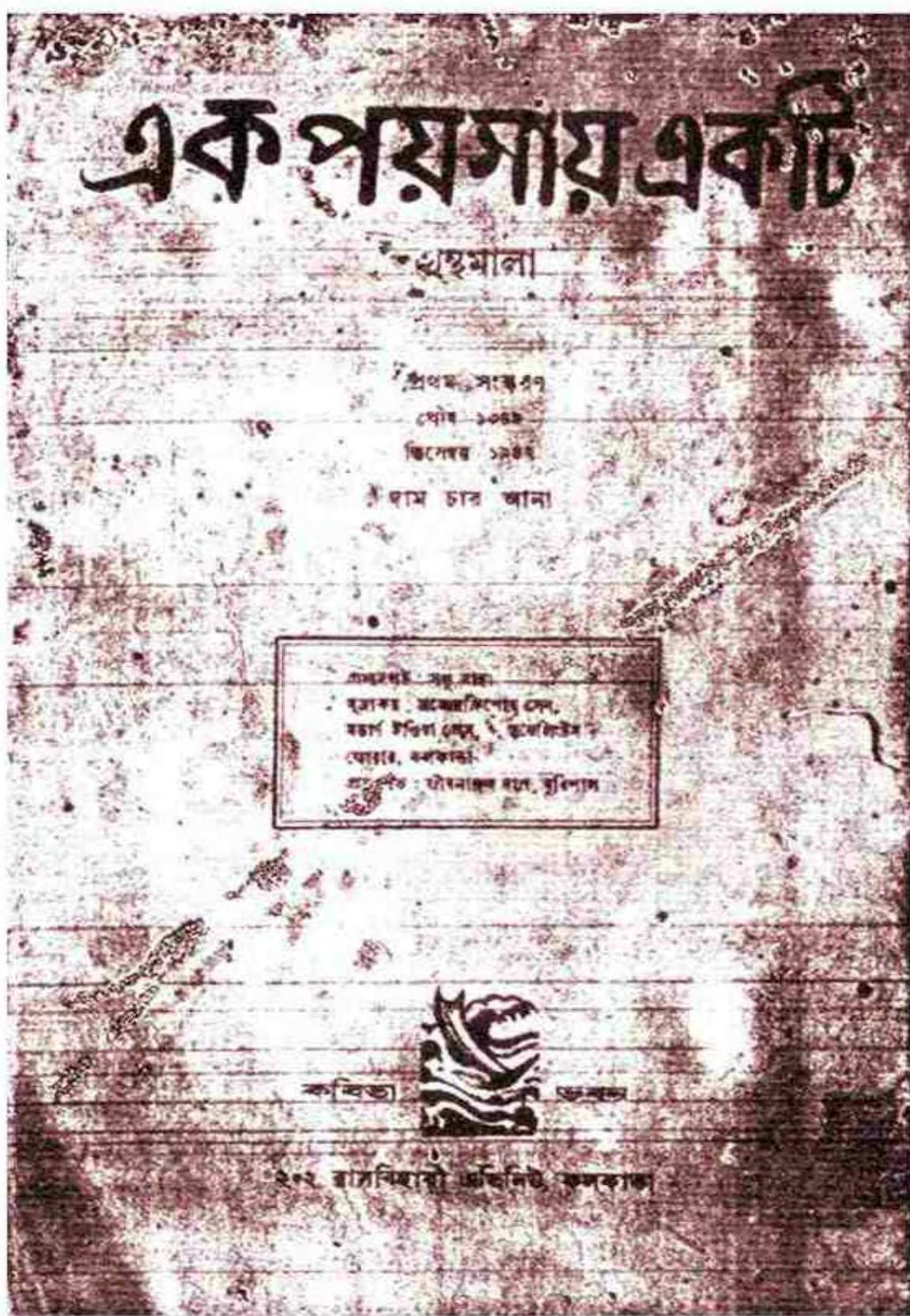
- 🌐 www.BDeBooks.com
- FACEBOOK FB.com/BDeBooksCom
- EMAIL BDeBooks.Com@gmail.com

ব্রহ্মতা স্নেহ

জীবনানন্দ দাশ

বনলতা শেন

জীবনানন্দ দাশ



'বনলতা সেন' প্রথম সংক্রণ পিছনের প্রচ্ছদ।। ১৯৮২

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ

রচনাকাল: ১৩৩২ থেকে ১৩৪৬

প্রথম প্রকাশ: ১৯৪২

‘বনলতা সেন’ প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজি ডিসেম্বর ১৯৪২, বাংলা ১৩৪৯ সালে; কবিতা- ভবন প্রকাশিত ‘এক পয়সায় একটি’ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে। প্রকাশক জীবনানন্দ দাশ নিজেই। কাগজের মলাটে ১৬ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন শস্ত্র সাহা। এই সংস্করণে কবিতা ছিল মোট ১২ টি। এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত ‘বনলতা সেন’ শীর্ষক কবিতাটি ইংরেজি ১৯৪৪ সালে পূর্বাশা লিমিটেড থেকে সত্যপ্রসন্ন দত্ত প্রকাশিত ‘মহাপ্রথিবী’ কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন জীবনানন্দ দাশ। পরবর্তিতে, জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর দুই বছর আগে, ইংরেজি ১৯৫২ সালে [বাংলা শ্রাবণ ১৩৫৯] কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকে বোর্ড বাঁধাইয়ে ৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয় ‘বনলতা সেন’। সিগনেট সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। মূল্য দুই টাকা। কবির জীবিতকালে এটিই ‘বনলতা সেন’- এর সর্বশেষ সংস্করণ। প্রকাশক ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত। এই সংস্করণে আগের সংস্করণ থেকে বেশি আরো ১৮টি কবিতাসহ মোট ৩০টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়, এর মধ্যে ‘বনলতা সেন’ শীর্ষক কবিতাটিও আবার স্থান পায়।

< <

সূচীপত্র

বনলতা সেন	দুজন
কুড়ি বছর পরে	অবশ্যে
হাওয়ার রাত	স্বপ্নের ধ্বনিরা
আমি যদি হতাম	আমাকে তুমি
ঘাস	তুমি
হায় চিল	ধান কাটা হয়ে গেছে
বুনো হাঁস	শিরীষের ডালপালা
শঙ্খমালা	হাজার বছর শুধু খেলা করে
নগু নির্জন হাত	সুরঞ্জনা
শিকার	মিতভাষণ
হরিণেরা	সবিতা
বেড়াল	সুচেতনা
সুদর্শনা	অদ্রান প্রান্তরে
অন্ধকার	পথ হাঁটা
কমলালেবু	তোমাকে
শ্যামলী	

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অঙ্ককারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিহিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অঙ্ককারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অঙ্ককার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবণ্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারঞ্চিনি- দ্বীপের ভিতর,
তেমনই দেখেছি তারে অঙ্ককারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিতে গেলে পাঞ্চলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ- জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অঙ্ককার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কবিতা | পৌষ ১৩৪২

কুড়ি বছর পরে

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি।

আবার বছর কুড়ি পরে—

হয়তো ধানের ছড়ার পাশে

কার্তিকের মাসে—

তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী

নরম-নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে।

অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর;

ব্যঙ্গতা নাইকো আর,

হাঁসের নীড়ের থেকে খড়

পাখির নীড়ের থেকে খড়

ছড়াতেছে; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি-কুড়ি, বছরের পার—

তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার।

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে

সরু-সরু কালো-কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,

শিরীষের অথবা জামের,

ঝাউয়ের—আমের;

কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে।

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার—

তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার!

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—

বাবলার গলির অঙ্ককারে

অশ্বের জানালার ফাঁকে

কোথায় লুকায় আপনাকে।
চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে—

সোনালি সোনালি চিল—শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে—
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাতে তোমারে।

কবিতা। পৌষ ১৩৪২

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক- একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো- ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো, উড়ছে
সে!
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূরস প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বথের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির- ভেজা চোখের
মতো

ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জোছনারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল
আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়- কুয়াশায় দীর্ঘ বর্ণ হাতে
করে

কাতারে- কাতের দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?

বনলতা সেন।

জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গভীর স্তন্ত তুলবার জন্য?

আড়ষ্ট—অভিভূত হয়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল!
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে, শাঁই শাঁই করে,
সিংহের ভুক্ষারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজন্ত জেরার মতো!

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত- প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আন্ধাণে
মিলনোন্মত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ
উচ্ছ্঵াসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মন্ততায়!

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তলকে তারায়- তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

কবিতা । চৈত্র ১৩৪২

বনলতা সেন।

আমি যদি হতাম

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি
কোনো এক দিগন্তের জলসিডি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে;

তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রূপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
হয়তো গুলির শব্দ:
আমাদের ত্যরিক গতিস্থাত,
আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস,
আমাদের কঢ়ে উত্তর হাওয়ার গান!

হয়তো গুলির শব্দ আবার:
আমাদের স্তুতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না;
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;
আমি যদি বনহংস হতাম;
বনহংসী হতে যদি তুমি;

বনলতা সেন।

কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

কবিতা। চৈত্র ১৩৪২

ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুস্থান—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের এই আণ হরিং মদের মতো
গোলাসে গোলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস- মাতার
শরীরের সুস্বাদ অঙ্ককার থেকে নেমে।

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে- উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনে? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে
ভালোবাসে!

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে- উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

কবিতা। চৈত্র ১৩৪২

বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহবানে
বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই- শাঁই শব্দ শুনি তার;
এক—দুই—তিন—চার—অজন্ম—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঙ্গিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।

তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের আগ—দু- একটা কল্পনার হাঁস;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরূপিমা সান্যালের মুখ;
উডুক- উডুক তারা পটুষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উডুক

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধনি সব রঙ মুছে গেল পর
উডুক- উডুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৩

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
 সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
 বলিল, তোমারে চাই:
 বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
 খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
 সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
 জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে—
 ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অস্তানের অঙ্ককারে
 ধানসিড়ি বেয়ে-বেয়ে
 সোনার সিড়ির মতো ধানে আর ধানে
 তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্শ পাখির রঙে ভরা;
 সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা-
 বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
 শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার;
 দুইখানা হাত তার হিম;
 চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
 চিতা জলে: দক্ষিণ শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
 সে আগুনে হায়।

চোখে তার
 যেন শত শতাব্দীর নীল অঙ্ককার!
 স্তন তার
 করঞ্চ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র-কবেকার শঙ্খনীমালার!
 এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

নগু নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে:
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।
যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনাদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছে।

মনে হয় কোন্ বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারত সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন্ এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ;
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা;
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঞ্জের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক;

অনেক কমলা রঞ্জের রোদ ছিল,
অনেক কমলা রঞ্জের রোদ;
আর তুমি ছিলে;

তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্ভুজের বেদনাময় রেখা,
লুণ্ঠ নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাঞ্চলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়- পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস-
আয়ুহীন স্তুতা ও বিস্ময়।

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

কবিতা । আশ্বিন ১৩৪৩

শিকার

তোর;

আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল:
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।

একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে:

পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি- মদির মেয়েটির মতো;

কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা

আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল

হাজার- হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি-

তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর ‘উম’ রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা

সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—

মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন:—

শুকনো অশ্বথ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুকুমের মতো নেই আর;

হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।

সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ

ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

তোর;

সারারাত চিতাবাধিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে

নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অঙ্ককারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে

ঘুরে ঘুরে

সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল!

এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;

কচি বাতাবিলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধী ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে;

নদীর তীক্ষ্ণ শীতল চেউয়ে সে নামল—

বনলতা সেন।

ঘুমহীন ক্লান্ত বিহুল শরীরটাকে স্বাতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায় ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো

একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য;

এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্ণার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।
একটা অঙ্গুত শব্দ।

নদীর জল মচকাফুলের পাঁপড়ির মতো লাল।

আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।

নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরনো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;

টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;

এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিষ্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

কবিতা | আশ্বিন ১৩৪৩

হরিণেরা

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝরে ঘায়

পল্লবের ফাঁকে- ফাঁকে—বনে- বনে—হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জ্বলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—

বিলৃষ্ট ধূসর কোন্ পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

কবিতা | পৌষ ১৩৪৩

বেড়াল

সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে- ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়:
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামি পাতার ভিড়ে;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর সাদা মাটির কক্ষালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে- পিছনে চলেছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান- রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে- বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো- ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমন্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

কবিতা | চৈত্র ১৩৪৩

বনলতা সেন।

সুদর্শনা

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিম্বরকঞ্চ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

সবচেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো;
তরুও সময় স্থির নয়;
আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয়।

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর; তুমি দান করো নি তো;
সময় তোমাকে সব দান করে মৃতদার বলে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

কবিতা | আবাদ ১৩৫৮

বনলতা সেন।

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল-ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার;
তাকিয়ে দেখলাম পাঞ্চুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিডি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগব না জেনে
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন জাগব না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীত্বতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—
জানো না কি চাঁদ,
জানো না কি নিশ্চিথ,
আমি অনেক দিন—
অনেক- অনেক দিন
অন্ধকারের সারাঃসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাতে ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার;
তব পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে;

বনলতা সেন।

সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।

হায়, উৎসব!

হৃদয়ের অবিরল অঙ্গকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অঙ্গকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।

হে নর, হে নারী,

তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।

যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রাহি,
শত-শত শূকরের চিঙ্কার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;

এই সব ভয়াবহ আরতি!

গভীর অঙ্গকারের ঘুমের আস্থাদে আমার আত্মা লালিত;

আমাকে কেন জাগাতে চাও?

হে সময়গ্রাহি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে সূতি, হে হিম
হাওয়া

আমাকে জাগাতে চাও কেন।

অরব অঙ্গকারের ঘুম থেকে নদীর ছল-ছল শব্দে জেগে উঠব না আর;
তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে

কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিঙ্গি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পটুয়ের রাতে—
কোনদিন জাগব না জেনে—

বনলতা সেন।

কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর।

চৈত্র ১৩৫৬

বনলতা সেন।

কমলালেবু

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি প্রথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুরুর বিছানার কিনারে।

কবিতা | পৌষ ১৩৪৪

শ্যামলী

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন;
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে,
মহিলারই প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে
সকালের রুট রৌদ্র ডুবে যেত কোথায় অকুলে।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনও
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল;
মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময়;
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত-নদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে
কাল কিছু হয়েছিল;—হবে কি শাশ্ত্রকাল পরে।

দেশ | শারদীয় ১৩৫৬

বনলতা সেন।

দুজন

‘আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো; —এক নক্ষত্রের নিচে তবু—একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়;
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়;
হয় নাকি?’—বলে সে তাকাল তার সঙ্গীর দিকে;
আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অস্ত্রাণ-কার্তিকে
প্রাণ তার ভরে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এল—মনে হয়—যেন কিছু চেয়ে—কিছু একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশ্বথের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে নড়ে-চড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে;
সেই ব্যাঙ্গ প্রান্তরে দুজন; চারি দিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে; —চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাঙ্গ নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে: ‘পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি; —তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল; —একদিন হৃদয়ে আঘাত চের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝরে গেছে; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না

হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'

এই বলে ত্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অস্বাগের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে- ছেনে যেতেছে শরীর;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির; —

প্রেমিকের মনে হল: ‘এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে;
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর—জনিত বাসনা নিজে—বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অম্বতের হরিণীর ভিড় থেকে ইল্লিতেরে তার।’

কবিতা | বৈশাখ ১৩৫৭

অবশ্যে

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু- উঁচু গাছ।
সবুজ পাতার পরে যখন নেমেছে এসে দুপুরের সূর্যের আঁচ
নদীতে সুরণ করে একবার পৃথিবীর সকাল বেলাকে।
আবার বিকেল হলে অতিকায় হরিণের মতো শান্ত থাকে
এই সব গাছগুলো;—যেন কোন দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস
বাঘের আগের মতো হৃদয়ে জাগায়ে যায় ত্রাস;
চেয়ে দেখ—ইহাদের পরম্পর নীলিম বিন্যাস
নড়ে ওঠে অস্তায়;—আধো নীল আকাশের বুকে
হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙ্গের তুরঙ্কে
অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে তারা বটে;
একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে;
তবুও বাধিনী হয়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করে—
সাগরের বালি আর রাত্রির নক্ষত্রের তরে।

বৈশাখী । ১ ১৩৪৮

বনলতা সেন।

স্বপ্নের ধৰনিৱা

স্বপ্নের ধৰণিনা এসে বলে যায়: স্থৰিতা সব চেয়ে ভালো;
নিষ্ঠক শীতের রাতে দীপ জ্বলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে
স্থৰিতের চোখে যেন জমে ওঠে অন্য কোন্ বিকেলের আলো।

সেই আলো চিৰদিন হয়ে থাকে স্থিৰ;
সব ছেড়ে একদিন আমিও স্থৰিত
হয়ে যাব; সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরিৰ কাজ ফেলে
প্ৰদীপ নিভায়ে রব বিছানায় শুয়ে;
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে রব
বাদুড়ের আঁকাৰাঁকা আকাশেৰ মতো।

স্থৰিতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।

কবিতা | পৌষ ১৩৪৪

বনলতা সেন।

আমাকে তুমি

আমাকে

তুমি দেখিয়েছিলে একদিন:

মন্ত বড় ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পর মাইল
দুপুরবেলার জনবিরল গভীর বাতাস

দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়;
জোয়ারের মতো ফিরে আসে আবার;

জানালায়-জানালায় অনেক ক্ষণ ধরে কথা বলে:

পৃথিবীকে মায়াবী নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।

তারপর

দূরে

অনেক দূরে

খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান
গায়—

এই দুপুরের বাতাস।

এক- একটা দুপুরে এক- একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়ে যায় যেন।

বিকেলে নরম মুহূর্ত;

নদীর জলের ভিতর শম্ভুর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা যাওয়া;

একটা ধ্বল চিতল- হরিণীর ছায়া

আতার ধূসর ক্ষীরে- গড়া মূর্তির মতো

নদীর জলে

সমস্ত বিকেলবেলা ধরে

ঙ্গির!

মাঝে- মাঝে অনেক দূর থেকে শৃশানের চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ,

আগুণের—ঘিরের আগ;

বিকেলে

বনলতা সেন।

অসমৰ বিষণ্ণতা।

ঝাউ হৱীতকী শাল, নিভন্ত সূর্যে
পিয়াশাল পিয়াল আমলকী দেবদারু—
বাতাসের রুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা;

শাদা শাদাছিট কালো পায়রার ওড়াওড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়,
রাত্রি;
নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
অতীত নিষ্ঠুরতা।

মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার
এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।

তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারি দিকে উজ্জ্বল আকাশ;
বাতাসে নীলাভ হয়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস;
কাঁচপোকা ঘূমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সে- ও ঘুমে;
আম নিম হিজলের ব্যাণ্ডিতে পড়ে আছ তুমি।

‘মাটির অনেক নিচে চলে গেছ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ? কোন্ কথা ভাবছ আঁধারে?
ওই যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে:
মনে হয় তুমি যেন ওই পাখি—তুমি ছাড়া সময়ের এ- উভাবনে

আমার এমন কাছে—আশ্চিনের এত বড় অকূল আকাশে
আর কাকে পাব এই সহজ গভীর অন্যায়ে—’
বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

কবিতা | আষাঢ় ১৩৫৮

বনলতা সেন।

ধান কাটা হয়ে গেছে

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙ্গা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
এই সব উৎরায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।

ঐখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হত কত- কত দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ;
শান্তি তবু: গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়ং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

কবিতা । আশ্বিন ১৩৫৮

বনলতা সেন।

শিরীষের ডালপালা

শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে,
পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন;
বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মাঝের আবেগে
করণ হয়েছে ঝাউবন।

নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে
ভেসে নারকোলবনে কেড়ে নেয় কোরালীর ঝণ;
বিকেল বলেছে এই নদীটিকে: ‘শান্ত হতে হবে—’
অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ

হয়ে আছে। তার মুখ মনে পড়ে এ-রকম স্নিফ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এলে; চারিদিকে রাত্রি- নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো; তরুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

কবিতা | আষাঢ় ১৩৫৮

বনলতা সেন।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো;
চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু- ছায়া ইত্তত
বিচূর্ণ থামের মতো: দ্বারকার;—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, স্নান।
শরীরে ঘুমের আগ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
‘মনে আছে?’ শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু, ‘বনলতা সেন?’

কবিতা | আশ্বিন ১৩৪৩

সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন;
কালো চোখ মেলে ওই নীলিমা দেখেছ;
গ্রীক-হিন্দু-ফিনিশিয় নিয়মের রূপ আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে? কী পেয়েছে?—গিয়েছে হারায়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের;
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো;
তবুও সমুদ্র নীল; বিনুকের গায়ে আলপনা;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোন সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উত্তরোল বড় সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সজ্জ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অঙ্কার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা।
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহুল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে; —
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

মিতভাষণ

তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্গের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে;
তোমার মুখের স্নিঘ প্রতিভার পানে।

অনেক সমুদ্র ঘূরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা- আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রেয়তর বেলাভূমি:
যা হয়েছে যা হতেছে এখনি যা হবে
তার স্নিঘ মালতী- সৌরভে।

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;
বড়ো- বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঞ্চল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিঘ শুশ্রার জল, সূর্য মানে আলো;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

আনন্দবাজার পত্রিকা | শারদীয় ১৩৫৫

বনলতা সেন।

সবিতা

সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে:
ভূমধ্যসাগর ঘিরে সেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিঞ্চুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী,
রেশম, মদের সার্থবাহ,
দুধের মতন শাদা নারী।

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাশ্বত রাত্রির দিকে তবে
সহসা বিকেলবেলা শেষ হয়ে গেলে
চলে যেত কেমন নীরবে।
চারি দিকে ছায়া ঘূম সপ্তর্ষি নক্ষত্র;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির করে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খৃষ্টান।

তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা—
সিঞ্চুর রাত্রির জল জানে—
আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে;
কেমন অনন্যোপায় হাওয়ার আহানে
আমরা অকূল হয়ে উঠে
মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে
জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায়
যেতাম তো সাগরের স্নিদ্ধ কলরবে।

এখন অপর আলো প্রথিবীতে জ্বলে:
কী এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আণ্ডন।
তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্রলিক খণ্টান সিঞ্চুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন;
কত কাছে—তবু কত দূর।

অভ্যন্তর | শারদীয় ১৩৫৪

সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর ধীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারঢিনি- বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক ঝঃঃ রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঝগী পৃথিবীরই কাছে।

কেবলই জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয়;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরও প্রাণ
মুক করে রাখে; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল; —
প্রায় তত দূর ভালো মানব- সমাজ

আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, চের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মাটি- পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্ত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

অস্রান প্রান্তরে

‘জানি আমি তোমার দু-চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর, পৃথিবীর
‘পরে—’

বলে চুপে থামলাম, কেবলি অশথপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মির়োনো ছেঁড়া; —অস্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে:
সে সবের দ্বারা আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু; বললে সে, ‘ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিষ্ঠন্তা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে’; —কিছুক্ষণ অস্রানের অস্পষ্ট জগতে
হাঁটলাম, চিল উড়ে চলে গেছে—কুয়াশার প্রান্তরের পথে
দু-একটা সজারূর আসা-যাওয়া; উচ্ছল কলার ঝাড়ে উড়ে চুপে সন্ধ্যার
বাতাসে

লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে;
আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাণ্ডি আজো যেন লেগে আছে বহতা
পাখায়

ঐ সব পাখিদের; ঐ সব দূর-দূর ধানক্ষেতে, ছাতকুড়োমাখা ক্লান্ত জামের
শাখায়;

নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িওর হন্দয়ের মতো নীরবতা
ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তরের বুকে আজ... হেঁটে চলি... আজ কোনো কথা
নেই আর আমাদের; মাঠের কিনারে দ্বে ঝরা ঝাউফল
পড়ে আছে; শান্ত হাত, চোখে তার বিকেলের মতন অতল

কিছু আছে; খড়কুটো উড়ে এসে লেগে আছে শাড়ির ভিতরে,

সজনে পাতার গুঁড়ি চুলে বেঁধে গিয়ে নড়ে-চড়ে;
পতঙ্গ পালক জল—চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বলতা নাশ;
আলেয়ার মতো ওই ধানগুলো নড়ে শূন্যে কী রকম অবাধ আকাশ
হয়ে যায়; সময়ও অপার-তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধরে আছে বলে সে-ও সন্নাতন; —কিষ্ট এই ব্যর্থ ধারণা

সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
যেই স্পষ্ট নির্লিপিতে—তাই-ই ঠিক; —ওখানে সিঙ্গ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়—নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।

কবিতা | আশ্বিন ১৩৫৮

পথহাঁটা

কী এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে:

সারারাত গ্যাস লাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে।
কেউ ভুল করে নাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাঁদ সব
চুপ হয়ে ঘূমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।

একা-একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব;
তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে;—মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সন্তুষ্টি

আর কিছু দেখেছি কি: একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট- ভরা কলকাতা?
চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধূলো খড়;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামি জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে; বেবিলনে একা-একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজও আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

তোমাকে

একদিন মনে হতো জলের মতন তুমি।
সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—
অথবা দুপুরবেলা—বিকেলের আসন্ন আলোয়—
চেয়ে আছে—চলে যায়—জলের প্রতিভা।

মনে হতো তীরের উপরে বসে থেকে।
আবিষ্ট পুরুর থেকে সিঙ্গাড়ার ফল
কেউ কেউ তুলে নিয়ে চলে গেলে—নিচে
তোমার মুখের মতন অবিকল

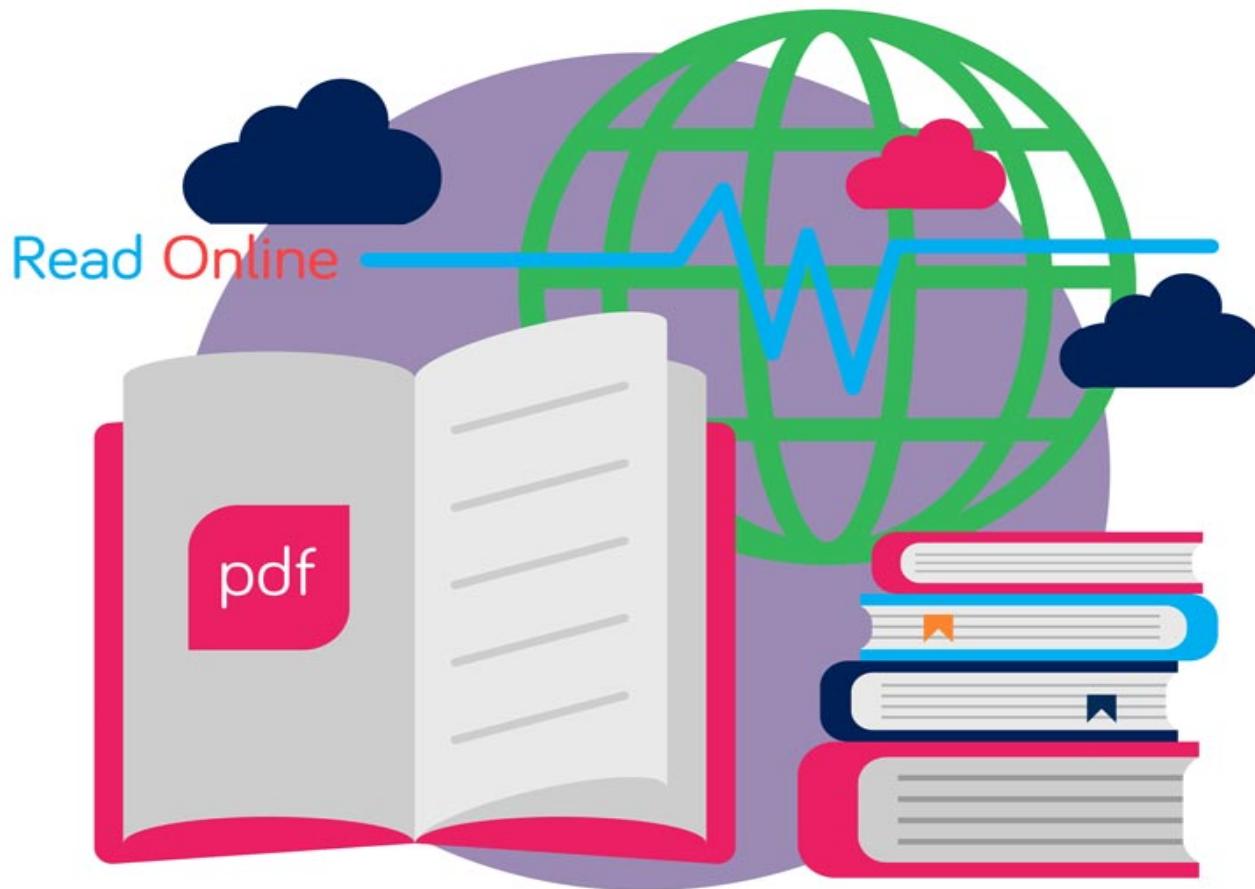
নির্জন জলের রঙ তাকায়ে রয়েছে;
স্নানান্তরিত হয়ে দিবসের আলোর ভিতরে
নিজের মুখের ঠাণ্ডা জলরেখা নিয়ে
পুনরায় শ্যাম পরগাছা সৃষ্টি করে;

এক পৃথিবীর রক্ত নিপতিত হয়ে গেছে জেনে
এক পৃথিবীর আলো সব দিকে নিতে যায় বলে
রঙ্গিন সাপকে তার বুকের ভিতরে টেনে নেয়:
অপরাহ্নে আকাশের রং ফিকে হলে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাতঃ
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

পরিচয়। বৈশাখ ১৩৪৮

বনলতা সেন।



E-BOOK

- 🌐 www.BDeBooks.com
- FACEBOOK FB.com/BDeBooksCom
- EMAIL BDeBooks.Com@gmail.com